নিবেদন

'বাপ-মাওয়র আশুরবাদ
খা বাছা তুই দুধ-ভাত।'

— রাজবংশী প্রবাদ

গ্রামীণ উত্তরবঙ্গের আবহে আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা। ছোটবেলায় পড়াশুনোর ফাঁকে অন্যান্য গ্রামের আত্মীয়বাড়ি বেড়ানোটা বেশ উপভোগ করতাম। বেশি যেতাম দিদির বাড়ি। দিদির শ্বশুরবাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ির সীমান্ত ঘেঁষা গ্রাম—শিঙ্গিমারী। জামাইবাবুরা ছিলেন বর্ধিষ্ণু কৃষক। তাই দিদির বাড়ি যাওয়া মানেই সারাদিন 'আখুলিয়া'র (যিনি গরু-মোষের দেখভাল করেন) সঙ্গী হয়ে মোষের পিঠে টৈ টৈ, তাঁর দোতারার গান, মন চাইলে এন্তার আম-কাঁঠালের ভাগ, কোনো কোনো দিন পাঙ্গা নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরা, সন্ধ্যায় 'ডারিঘরা'য় (বৈঠকখানা) বসে পালাটিয়া গানের মহড়া শোনা। এই দিদির বাড়িতেই প্রথম আমি রাজবংশী প্রবাদ, ছিলকা (ধাঁধা), লোককথা শুনি।

তখন গ্রামে 'হাউলি' প্রথার চল ছিলো। যেদিন যে জোতদারের জমির ধান কি পাট কাটা হবে, সেদিন সেই গ্রামের অন্যান্য কৃষকেরা সে কাজে বিনা পারিশ্রমিকে যোগ দেবেন। বিনিময়ে তাঁদের আপ্যায়নের জন্য থাকতো ঢালাও 'হাঁস-ভাত' বা 'খাসি-ভাত'-এর (মাংস-ভাত) ব্যবস্থা। একবার এরকমই একটা 'হাউলি-পার্টি'তে একজন মধ্যবয়স্ক রসিক কৃষককে দেখেছিলাম, নাম— বাংরু। বাংরুকা'র (বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই তাঁকে বাংরুকা বলেই ডাকতাম) কাজ ছিলো যত না কাজ করা, তার চেয়ে বেশি গানে-গল্পে-ছিলকায়-প্রবাদে কর্মরত কৃষকদের

মাতিয়ে রাখা। তাঁর বলার ভঙ্গীটিও ছিলো নাটকীয়। অর্থাৎ বিনোদনের 'মাধ্যম'-এ সবাইকে কাজে উৎসাহিত করা। এই সংযোগ-এর কাজটির জন্য এলাকায় তার ভাও ছিলো বেশ। শুনেছি দূরদূরান্তের গ্রামগুলিতেও 'হাউলি-পার্টি'তে বাংরুকা'র ডাক পড়তো।

পরে কর্মজীবনে এসেও বাংরুকা'কে মনে রেখেছি অনেকদিন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতোকত্তর পাঠ শেষ করেই সাংবাদিকতার চাকরি পেয়ে যাই শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ। ১৯৮১-৮২ সালের ওই সময়টায়, জন্মসূত্রে রাজবংশী হওয়ার সুবাদেই সম্ভবত, আমার ওপর দায়িত্ব বর্তায় রাজবংশী কথাশ্রিত একটি সাপ্তাহিক কলাম লেখার। পত্রিকাটির তৎকালীন প্রধান সম্পাদক, সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসু চেয়েছিলেন, উত্তরবঙ্গ যেহেতু রাজবংশী অধ্যুষিত জনপদ, কলামটি তাঁদের ভাষাতেই লেখা হোক। শুরু হলো লেখা— 'গাঁওবুড়ার চিঠি'। গ্রামজীবনের দৈনন্দিন সমস্যার প্রতি আলোকপাত; পাশাপাশি কৃষি-স্বাস্থ্য-শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী প্রকল্পগুলির কার্যকারিতাকে রাজবংশী ভাষায় জনগ্রাহী করে তোলার সাপ্তাহিক প্রয়াস— এই ছিলো 'গাঁওবুড়ার চিঠি'র উপজীব্য। 'গাঁওবুড়া' নামের আড়ালে কলামটি লিখতে গিয়ে আশ্রয় করেছিলাম বাংরুকা'র প্রয়োগ কুশলতাকেই। চিঠির বয়ানকে সহজ-গ্রাহ্য করতে নির্ভর করেছিলাম বহু রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের ওপর। প্রবাদের তীব্র শ্লেষাত্মক অথচ সরস প্রকাশভঙ্গী সহায়ক হয়েছিলো 'হালকা চালে গভীর কথা' বলার। বস্তুতঃ তখনই আমার নজরে আসে বহুবিধ রাজবংশী কথা ও প্রবাদ ভাণ্ডারের।

তারও অনেক পরে আমার সম্পাদিত 'রাজবংশী লোককথা' গ্রন্থটির (দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৬, ২০০৩) জন্য সংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে সন্ধান পেলাম আরো অনেক অপরিচিত প্রবাদ-প্রবচনের। গ্রামেগঞ্জে ঘুরতে গিয়ে পেয়ে গেলাম এমন কিছু লোক-কথাকার, যাঁদের সুচারু নির্মাণে প্রবাদাশ্রয়ী 'কথা'গুলি হয়ে উঠতো একেকটি ভিন্ন স্বাদের নিটোল কথা-চিত্র-নাট্য। কথকদের মনে হতো এক একজন 'লিভিং জার্নাল'। বলাবাহুল্য, এই অনুঘটকগুলিই ছিলো আমার বর্তমান গবেষণার 'সলতে পাকানোর পর্ব'।

এই ইচ্ছেটুকু নিয়েই একদিন দ্বারস্থ হই বর্তমান গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের। বয়সের নিরিখে অনুজ-প্রতিম হলেও, সাহিত্য সংস্কৃতি বিশেষত রাজবংশী সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অগ্রণী-অভিনিবেশ ও লেখালেখির সঙ্গে আমার সম্যক পরিচিতি ছিলোই। তজ্জনিত সম্ভ্রম এবং আস্থার কারণে, তাঁর তত্ত্বাবধানেই গবেষণার ইচ্ছা প্রকাশ করি। ড. রায়ের নিরন্তর সুপরামর্শ, ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে মূল্যবান বইপত্রাদি দিয়ে সাহায্য ও নানাবিধ সহযোগের ফলশ্রুতিতেই গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করা সম্ভব হলো। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

বিভাগীয় শিক্ষক ড. অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের সরাসরি ছাত্র আমি। গবেষণার দৈনন্দিন কাজের বাইরে থেকেও, আমার প্রতি তাঁর স্নেহশীল শুভেচ্ছা আমাকে বরাবর উৎসাহ যুগিয়েছে— কৃতজ্ঞতা তাঁর কাছেও। বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণ, আসা-যাওয়ার ফাঁকের আলাপচারিতায় কাজটি সমাধা করার জন্য যে আন্তরিক উৎসাহ দিয়েছেন, সকৃতজ্ঞ উল্লেখ করতে হয় তারও। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য ড. দীপককুমার রায় মহাশয়ের কথা; উত্তরবঙ্গের লোকজীবন ও লোকভাষা নিয়ে যাঁর মূল্যবান সব কাজকর্ম সহজেই শ্রদ্ধা কেড়ে নেয়। গবেষণাপত্র প্রস্তুতির নানা ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ আমাকে চিরঋণী করে রেখেছে, কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকেও।

এছাড়াও কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গার অরবিন্দ ডাকুয়া এবং ভেটাগুড়ির দীনবন্ধু বর্মণ তাঁদের প্রকাশিত রাজবংশী প্রবাদ সংকলন পাঠিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন ময়নাগুড়ির বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক দীনেশ রায়, জলপাইগুড়ির দিলীপ বর্মা, বারোবিশা হাই স্কুলের শিক্ষক জ্যোতির্ময় রায়, মালদা সামসি কলেজের অধ্যাপক নারায়ণ বসুনীয়া, গাজল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌরাঙ্গ ভার্মা, ভাওয়াইয়া শিল্পী জিনাত আমন, লাহাঙ্কারী গানের শিল্পীদ্বয় তারণ সিংহ ও গজেন সিংহ, নকশালবাড়ির কৃষি বিভাগের কর্মী শৈলেন রায় সহ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার বহু শুভানুধ্যায়ী মানুষ — এঁদের সকলের প্রতিই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

এ জাতীয় ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক কাজে যাঁরা সচরাচর নেপথ্যে থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা সমীক্ষাধীন অঞ্চলের গ্রামবাসী। ইতোমধ্যে সংকলিত প্রবাদ সমূহ এবং ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রবাদের একটি সংগ্রহ অংশ পরিশিষ্ট-এ উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছি তাঁদের কাছেও— যাঁরা প্রবাদগুলি দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। তাছাড়া প্রবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দৈনিক পত্রিকা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে যাঁরা ডাকযোগে প্রবাদ পাঠিয়েছেন— কৃতজ্ঞতা তাঁদের কাছেও। কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থগার, কলকাতাস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতির কাছে, যারা অনুমতি দিয়েছেন বইপত্রাদি ব্যবহারের। প্রুফ দেখে আমার পরিশ্রম বহুলাংশেই লাঘব করেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী সুজিত বর্মণ, বিনয় বর্মণ, শেখর সরকার, প্রীতিলতা রায়— এরা সকলেই আমার স্নেহভাজন, তাই কৃতজ্ঞতার চেয়ে এদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভ কামনা। কার্যত খুব কম সময়ের মধ্যে বুবুনকুমার বর্মণ যেভাবে টাইপের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন তা তুলনাতীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বানানের ক্ষেত্রে রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের উচ্চারণভঙ্গির যথার্থতা রক্ষা করার জন্য প্রচলিত বানান রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছি।

সার্বিক এই বিচারে বর্তমান গবেষণাপত্রটি তাই একক নামোল্লেখে পরিবেশিত হলেও, কার্যত এক সমষ্টিগত প্রয়াসের ফল। জাতীয় জীবনের সামগ্রিক ইতিহাস সংরক্ষণে লোকসংস্কৃতির অনুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান নিশ্চিতভাবেই জরুরী। বিশেষ করে নাগরিক আগ্রাসনের এই কালে অনুসন্ধানের এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা লোকভাষা, লোকবিশ্বাস, লোকশিল্প, লোকগান, লোকমানসিকতা— বিচিত্রমুখীনতায় আজও ক্রিয়াশীল। একটা অনুসন্ধানে এর ব্যাপ্তিকে ধরা বোধহয় সম্ভব নয়। তবু আমি চেষ্টা করেছি লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা— প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজীবনের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখাটি অনুসন্ধান করতে যা ইতিপূর্বে এই বিস্তৃতিতে কোথাও আলোচিত হয়নি বলেই আমার ধারণা। সেদিক থেকে বর্তমান এই সমীক্ষণ আমাদের বৃহত্তর জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূলকেই আরো নতুন আলোয় আবিস্কারের অনুপ্রেরণা দেবে বলে মনে করি। আমাদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে রাজবংশী প্রবাদেও ধ্বনিত

হয়েছে—

'বাপ-মাওয়র আশুরবাদ

খা বাছা তুই দুধ-ভাত।'

পরিশেষে তাই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্বর্গত মাতা-পিতার প্রতি, কারণ তাঁদের 'বাছা' হয়ে এই মাটিতে না এলে, আমার একাজ করার সুযোগ হতো না— তাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভবও হতো না।

(তপন রায় প্রধান)

তাং: ৭.১.২০১৪

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়